ওরা যেন কীট দংশিত কুঁড়ি না হয়

কাইউম পারভেজ, সিডনি থেকে

গত ২২ নবেম্বরের দৈনিক জনকণ্ঠে 'রাজনীতিতে জড়াবেন না শিশুদের' শীর্ষক একটি চমৎকার বাস্তবধর্মী সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকবার পড়েছি। মন চোখ দুই-ই ভিজেছে। চোখের সমুখে যেন দেখতে পেয়েছি দেশের শিশুরা রাস্তায় ইট ভাঙছে। ঠেলাগাড়ি ঠেলছে। নয়ত কুলি মজুর হয়েছে। পাতা কুড়ানি নয়ত টোকাই হয়ে রাস্তায় যা পাচ্ছে তাই টোকাচ্ছে। সম্পাদকীয়টিতে যদিও এমনি করে শিশুদের চিত্র তুলে ধরা হয়নি তবে জীবিকার তাগিদে এ ধরনের শিশুশ্রমের কথা এসেছে। সম্পাদকীয়-র শুরুটা হয়েছে এভাবে– ''আমাদের দেশের শিশুরা শুধু দারিদ্র্য অভাব-অনটন নিপীড়ন নির্যাতন আর অবেহেলা উপেক্ষার শিকারই নয়, এ সমাজে তারা নানা রকম অবিবেচনা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অপব্যবহারেরও শিকার হয়ে থাকে। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে অন্ধ হয়ে শিশুদের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অনৈতিক আচরণ প্রদর্শন করে। শিশুদের তারা স্কুল পর্যায়ে খেলাধুলার সরঞ্জাম দিয়ে প্রলুব্ধ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ফেলে।.... শিশুদের প্রতি এসব অবিবেচনাপূর্ণ আচার-আচরণ, রাজনীতির স্বার্থে তাদের যথেচ্ছ ব্যবহারের ক্ষতির প্রবণতা সমাজে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা উচিত।''

যে বিষয়টি থেকে সম্পাদকীয়-র এ সুন্দর ভূমিকা তা হলো– গত বুধবার ঢাকায় 'সেভ দ্য চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়া' চাইল্ড পার্লামেন্ট ২০০৮-এর অধিবেশনের আয়োজন করে শিশুদের মাধ্যমে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দেশের রাজনীতিবিদ তথা আপামর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আর বিষয়টি হলো– রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শিশুদের ব্যবহার বন্ধ করা। এমন একটি সময়ে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যখন দেশ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রস্তুতির পর্যায়ে। শিশুদের প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় সংগঠন 'চাইল্ড পার্লামেন্ট' নির্বাচনে বিশেষ করে নির্বাচনের প্রচারণার কাজে শিশুদের যথেচ্ছা ব্যবহার বন্ধের দাবিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। দেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কাছেও এ স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ক্ষুদে পার্লামেন্টারিয়ান একটি দলের কাছ থেকে নিজে সে স্মারকলিপি গ্রহণ করেছেন এবং তাদের সাথে কথা বলে ভবিষ্যতে যোগ্য পার্লামেন্টারিয়ান হয়ে দেশের সেবা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে সংসদে শিশুদের জন্য একটি গ্যালারির ব্যবস্থা তিনি করবেন। শিশুদের যেন রাজনীতিতে ব্যবহার করা না হয় সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

যে শিশুরা বিশেষত রাজনীতিতে ব্যবহৃত হয় ওরা মূলত তথাকথিত টোকাই শ্রেণীর। এবং এরা অধিকাংশ সময়ে ব্যবহৃত হয় পোস্টার সাঁটানো এবং মিছিলের কাজে। শেখ হাসিনা বরাবরই এদের প্রতি সজাগ এবং সদয়। তাঁর লেখা একটি বইও আছে 'ওরা টোকাই কেন' নামে। ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস শিশুদের রাজনীতিতে ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ নেয়া তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তিনি চাইলে যে অনেক কিছু সম্ভব করতে পারেন তা এবার মনোনয়ন প্রক্রিয়াতেই লক্ষ্য করা গেছে। প্রার্থী মনোনয়ন তৃণমূল থেকে চালু করে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ত্যাগী নেতাকর্মীদের ত্যাগের মূল্যায়ন করেছেন। গতানুগতিক প্রথা ভেঙে তরুণদের সমুখে টেনে এনেছেন। দুর্নীতিপরায়ণ নেতাকর্মীদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। ফলে শিশুদের রাজনীতিতে ব্যবহারের পথটাও তিনি রুদ্ধ করে দিতে পারবেন। তিনি তাঁর নেতাকর্মীদের কঠিন হুঁশিয়ারি দিলেই শিশুদের এ অপব্যবহার বন্ধ হয়ে যাবে। তেমনিভাবে বেগম খালেদা জিয়াও পারবেন এ মহান উদ্যোগটি নিতে। এ ব্যাপারটিতেও তিনি একটু আপোসহীন হলে সম্ভব।

''সেভ দ্য চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়া'' বাংলাদেশে এ উদ্যোগটি দারুণ প্রশংসিত হয়েছে এবং সাহসী এক কাজ করেছে। অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল পার্লামেন্টসহ সকল অঙ্গরাজ্যের পার্লামেন্টেও শিশুদের নিয়ে এ ধরনের 'মক' পার্লামেন্টের ব্যবস্থা করা হয়। শিশুদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের স্কুল থেকে। সেখানে বিশেষভাবে সাজানো ঘরে তারা কেউ প্রধানমন্ত্রী, কেউ বা বিরোধী দলের নেতা, কেউ স্পীকার বা সংসদ সদস্যের ভূমিকা পালন করে। প্রসঙ্গত একটা কথা মনে এলো। বাংলাদেশের চৌদ্দ কোটি মানুষের জন্য একটি মাত্র পার্লামেন্ট আর অস্ট্রেলিয়ায় ছয়টি স্টেট বা অঙ্গরাজ্য, দুটো টেরিটোরি আর ফেডারেল বা কেন্দ্র মিলে মোট নয়টি পার্লামেন্ট মাত্র দু'কোটি মানুষের জন্য। শিশুদের রাজনীতিতে জড়ানোর কোন সুযোগ নেই বা কেউ সেটা ভাবতেও পারে না এখানে। যেটা ভাবে– তা হলো শিশু অবস্থা থেকেই ওদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে নাগরিক সচেতনতাবোধ। পার্লামেন্ট ভবনে এসে তারা উপলব্ধি করে এখানে প্রণীত হয় একজন সাধারণ নাগরিকের সকল ন্যায়সঙ্গত অধিকারের আইন ও নিয়মনীতি। ক্যানবেরার ফেডারেল পার্লামেন্টে যে কেউ প্রবেশ করতে পারে। তা সেশন চলাকালীন হোক বা বিরতি কিংবা ছুটির সময়ে হোক। সিকিউরিটি চেক শেষে সরাসরি দর্শক গ্যালারিতে ঢুকে পড়লেই হলো। শর্ত একটাই ক্যামেরা এবং মোবাইল ফোন সঙ্গে নেয়া যাবে না। যখন অধিবেশন চলে তখন অনেকেই আসেন দেখতে তাঁর এলাকার সদস্য তাঁদের উন্নয়নে সংসদে কী ভূমিকা রাখছেন। কোন পাস বা পূর্ব অনুমূতির প্রয়োজন নেই। এই পার্লামেন্ট ভবনের আর্কিটেকচারাল ডিজাইনটা এমন যে বাইরে থেকে হেঁটে হেঁটে সোজা পার্লামেন্ট ভবনের ছাদে সবুজ ঘাসের লনের ওপর দিয়ে হাঁটা যায়। সকল দর্শনার্থী তাই করেন। এর একটা নৈতিক বা আদর্শিক দিকও আছে। সেটা অনেকটা প্রতীকী। তা হলো– জনগণ পার্লামেন্টের উর্ধে এবং মানুষের সেবা করাই তাদের একমাত্র এবং প্রধান কাজ।

অস্ট্রেলিয়ার শিশুরা বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে যায় এবং তা অবৈতনিক। শিশুরা স্কুলে না গেলে অভিভাবকদের জবাবদিহি করতে হয়। ওরা সংসদ ভবনেও যায়। তবে কখনো রাজনৈতিক কাজে ব্যবহৃত হয় না। রাস্তায় কোনদিন কখনও নির্বাচনের মিছিল স্লোগান হয় না। বড়রাই মিছিলে নেই তো শিশু। কোনদিন কখনও কোন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীর জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রোদ বৃষ্টি মাথায় করে রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ হয়ে ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। এ কথাটিও আলোচ্য সম্পাদকীয়তে এসেছে। কোমলমতি শিশুদের জোর করে ধরে এনে এ ধরনের শাস্তি দেয়া অন্যায়। নিজের দেশের একজন মন্ত্রী বা সাংসদ (বিদেশী কোন অতিথি নন) রাস্তা দিয়ে যাবেন তাতে ওই শিশুদের কী এসে গেলো? মন্ত্রী বা সংসদ সদস্যরাই বা কতটুকু লাভবান হন তাতে? আমার মনে হয় তাঁরা না যতটুকু চান তার চেয়ে বেশি করে চান 'চামচা'রা। এই তথাকথিত চামচাদের এ অনৈতিক তোষামুদীর পথ বন্ধ করতে হবে। সেটাও করতে পারবেন দেশের দুই প্রধান নেত্রী। আপনারা ক্ষমতায় গেলে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়ে রাস্তার দুধারে ক্লাস বাদ দিয়ে অসহায় শিশুদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার প্রথা বন্ধ করে দিন। বিদেশী মেহমান হলে অন্য কথা। সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোনভাবেই শিশুরা নিপীড়িত না হয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা দেশের বাইরে গেলে এবং ফিরে এলে বিমানবন্দরে কেন শিশুদের হাজির করতে হবে? মন্ত্রী

আমলাসহ সরকারী লোকজনকে কেন বিমানবন্দরে ছুটতে হবে? পাশ্চাত্যে এবং উন্নত দেশগুলোতে তো এই প্রথা নেই, তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে কেন এ প্রথা? এর অবসান হওয়া উচিত। তেমন করেই আবার বলি– আমাদের দুই নেত্রীই পারেন এ প্রথা বন্ধ করতে।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও শিশুরা নির্যাতিত হচ্ছে শিশুশ্রম, শিশুপাচার (বিশেষ করে উটের জকি হিসেবে ব্যবহারের জন্য) এবং যৌন হয়রানির মাধ্যমে। বাসা বাড়িতে যে শিশু কিশোর-কিশোরীরা কর্মরত তাদের প্রতি নিপীড়ন যেন নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই পত্রপত্রিকায় কাজের ছেলেমেয়ের ওপর পৈশাচিক নিপীড়নের খবর পাওয়া যায়। এর একটা স্থায়ী বিহিত হওয়া দরকার। গলা জোর করে বলতে পারছি না বাড়িতে কাজের লোক রাখার সিস্টেম বন্ধ করে দেয়া হোক, কেননা গরিব দেশে বাসা বাড়িতে কাজ করেও তো কারো পেট চলছে। সংসার চলছে। এ প্রবাসে নিজের স্ত্রী থেকে শুরু করে যাদেরকেই দেখি তারা সবাই নিজের চাকরি বজায় রেখে একাই বছরের পর বছর সংসার সামলাচ্ছেন। মানুষ তো অভ্যাসেরই দাস।

যাই হোক কোনভাবেই যেন আর শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা না হয়। আমরা যদি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত, তবে কোনভাবেই ওদেরকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করা যাবে না। শনিবারের সম্পাদকীয়তে এর ব্যাখ্যাটা আরও যথার্থ হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে– শিশুরা যেমন নিজেকে দেশকে বিশ্বকে জানার পাশাপাশি দেশের সুনাগরিক হয়ে বেড়ে উঠবে তেমনি সে বেড়ে উঠায় তাদেরকে দিতে হবে আহার বাসস্থান শিক্ষার নিরাপত্তা। ওদের দারিদ্র্যের কারণে ওরা যেন বিপজ্জনকভাবে ব্যবহৃত না হয়। গণতন্ত্র রাজনীতি পার্লামেন্ট সম্পর্কে ওরা অবশ্যই জানবে নিজেদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার প্রয়াসে, তবে তা কোনভাবেই কোন রাজনৈতিক দল বা নেতাকর্মীর স্বার্থে ব্যবহৃত হবার জন্য নয়। কেউ যেন শিশুর ক্ষুধা আর দারিদ্র্য নিয়ে রাজনৈতিক বাণিজ্য করতে না পারে সেটাই হোক আমাদের প্রাক নির্বাচনের অঙ্গীকার।

আশির দশকে একদিন জয়দেবপুর বাজারে কাশেমের জিলানী কনফেকশনারিতে কেনাকাটা করছিলাম। আমার কর্মস্থল তখন জয়দেবপুর। তো সে সময়েই রাস্তা দিয়ে একটি নির্বাচনী মিছিল যাচ্ছিল যার অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী ছিল শিশু-কিশোর। দশ বারো বছরের একটি শিশু ক্লান্ত ঘর্মাক্ত, মিছিল থেকে ছুটে এসে শুকনো একটি রুটি কিনে নিয়ে গোগ্রাসে খেতে শুরু করল। তার সাথে স্বল্প সময়ে আমার কিছু কথা যা আমাকে খুব আহত করেছিল। সে প্রেক্ষিতে বাড়ি ফিরে বিষণ্ন মনে 'তোমার ডাক' শিরোনামে একটি ছড়া লিখেছিলাম।প্রাসঙ্গিক হবে বিধায় ছড়াটি এখানে উদ্ধৃত করলাম:

আমার হাতে মার্কা দিয়ে
বললে– 'ব্যাটা স্লোগান দে'
কলিম ভাইকে ভোটটি দিলে
থাকবে সবাই আনন্দে।

আমার তখন পড়ার কথা
নয়তো খেলার মাঠেতে
এক মুঠো ভাত পাবার আশায়
চেঁচাই সকাল সন্ধেতে।

ভোটাভুটির কিইবা বুঝি
তন্ত্রমন্ত্র জিন্দাবাদ
এ সব স্লোগান কতই দিলাম
রোজ খাবো ভাত– ছিলো যে সাধ!

আমার কোন নাম থাকে না
পিচ্চি ছ্যারা নয় টোকাই
কাজ ফুরোলে অল্প কিছু
দিয়ে বল আর যে নাই।

তবুও আমি পথের ধারে
তোমার ডাকটি শুনতে চাই
মিছিল স্লোগান বন্ধ হলে
আমার ভাতের রাস্তা নাই।

লেখক : প্রবাসী শিক্ষাবিদ
ই-মেইল: q_parvez@hotmail.com

ওবামার বিজয় নিশ্চিত করেছে যে প্রযুক্তি

মূল ॥ পল হ্যারিস ও ডেভিড স্মিথ
অনুসৃতি ॥ আতাউর রহমান

বিষয়টি অনেকটা ফায়ার প্লেসের পাশে বসে খোশগল্প করার মতো। যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বচিত প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সপ্তাহে একদিন কথা বলবেন আমেরিকার ভোটারদের সঙ্গে। আর গত সপ্তাহে এভাবেই বারাক ওবামার সঙ্গে হোয়াইট হাউস প্রবেশ করল ইউটিউবের যুগে।

আমেরিকার জনগণের উদ্দেশে প্রতি সপ্তাহে একবার বেতার ভাষণদানের সূচনা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট। উদ্দেশ্য দেশের সমস্যা মোকাবেলায় সরকারের নেয়া কার্যক্রম অবহিত করা। আর এভাবেই তিনি ত্রিশের দশকের মহামন্দার বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন।